এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সমস্যা? কি করবেন??

আনার কলি
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (প্রশিক্ষণরত)

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার বা চাপের সম্মুখীন হই। এই সমস্যা হতে বের হয়ে আসার জন্য একেকজন একেক পদ্ধতি অবলম্বন করি। কেউ বা সমস্যার সময়ে মন খারাপ করে বসে থাকে, কান্নাকাটি করে, পালিয়ে বেড়ায়, দুঃশ্চিন্তা করে। কেউ আবার সমস্যার সময়ে অন্যের সাথে কথা ব'লে সাহায্য নেয় এবং নিজেও সমস্যার উপযোগী সমাধান বের করে কাজ করে। সাধারণত সমস্যার সাথে মোকাবিলা করার পদ্ধতিকে ২ ভাবে ভাগ করা যায়।

(১) অনুপযোগী অভিযোজন পদ্ধতি (Maladaptive Coping Strategy)

(২) উপযোগী অভিযোজন পদ্ধতি (Adaptive Coping Strategy)

(১) অনুপযোগী অভিযোজন পদ্ধতি ঃ অনেকগুলো অনুপযোগী পদ্ধতি আছে। যেমনঃ-

(ক) পরিত্যাগ করাঃ আমরা যখন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির সাথে বার বারই খাপ-খাওয়াতে পারি না, তখন আমাদের মধ্যে অসহায়ত্ব তৈরি হয়, হতাশা ও দুঃশ্চিন্তা বেড়ে যায় এবং আমাদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-বিশ্বাস কমে যেতে থাকে। তাই প্রথমেই কোন কাজ করার আগে নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং আমাদের কাজগুলো বাস্তবমুখী কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। তাহলে পরবর্তীতে আর পলায়ন করার দরকার হবে না।

(খ) অন্যকে আঘাত করাঃ- অনেক সময় আমরা এতটাই হতাশাগ্রস্থ থাকি যে হঠাৎ করে অন্যের উপর রেগে যাই। অপমান করি বা মারামারি করি। এতে করে অন্যের সাথে খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সামাজিক সমর্থন, সহানুভুতি হারিয়ে ফেলি। এর ফলে আমাদের আরও একটি চাপ তৈরি হয়।

(গ) নিজেকে প্রশ্রয়দানঃ- আমাদের অনেকেই চাপমূলক পরিস্থিতি হতে রেহাই পাবার জন্য নেশা করে, বেশী বেশী টাকা খরচ করে, শপিং করে, অথবা বেশি খেয়ে ফেলে। এই সব পদ্ধতি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা সীমা অতিক্রম না করে। ব্যক্তি যখন এই ক্ষতিপূরণ কাজগুলো বার বার করে তখন অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনঃ- কেউ বেশী খেয়ে মোটা হয়ে যেতে পারে, বেশী নেশা করলে নেশাগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে, বেশী টাকা খরচ করলে পরবর্তীতে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারে।

(ঘ) নিজেকে দায়ী মনে করাঃ- অনেক ঘটনা বা পরিস্থিতি যখন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় এবং খারাপ পরিস্থিতির তৈরি হয়। তখন ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়ে, নিজের সমালোচনা করে, নিজেকে, নিজেকে দোষী ভাবে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের শারীরিক ক্ষতি করারও চেষ্টা করে।

(ঙ) সত্য অস্বীকারঃ- অনেক সময় ব্যক্তি সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করে নিজেকে রক্ষা করতে চায়। যেমনঃ- একজন স্মোকার সিগারেট খাওয়ার ফলে যে শারীরিক ক্ষতি হয় সেটা সে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

(চ) কল্পনাঃ- অনেক সময় ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনের বিফলতা বা কষ্টের হাত হতে রেহাই পাবার জন্য কল্পনাতে নিজের কৃতকার্যতা দেখে আনন্দ পায়। যেমনঃ- একজন ব্যক্তি যে সব সময় তোতলায় সে কল্পনায় দেখে আনন্দ পায় যে, সে সবার সামনে অন্যদের মত খুব সুন্দরভাবে কথা বলছে।

(ছ) অবদমন ঃ- এই পদ্ধতিটা খুবই ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ব্যক্তি নিজের কষ্ট, ইচ্ছাগুলিকে নিজের মনের মধ্যে চাপিয়ে বা অবদমন করে রাখে। সেগুলো সে মনে করতে চায় না।

(জ) স্থানচ্যুতিঃ- অনেক সময় যে ব্যক্তির জন্য রাগ তৈরি হয় সেই রাগটা সেই ব্যক্তির উপর প্রকাশ করতে না পেরে অন্য ব্যক্তির উপর প্রকাশ করে। যেমনঃ অফিসের বসের বকা খেয়ে ব্যক্তি বউ অথবা কাজের লোকের উপর রাগ ঝাড়ে।

(ঝ) বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়াঃ- এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আসল অনুভূতি প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অনুভূতি প্রকাশ করে।

(২) গঠনমূলক অভিযোজন পদ্ধতিঃ- ব্যক্তি যখন উপরোক্ত অনুপযোগী অভিযোজন পদ্ধতি ব্যবহার করে তখন সে সাময়িক মুক্তি পেলেও তার আসল সমস্যাটি রয়েই যায় এবং বার বারই এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে করতে একটা সময় তার বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই অনুপযোগী পদ্ধতির চেয়ে গঠনমূলক পদ্ধতি কার্যকরী বেশী কারণ এতে ব্যক্তি সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং যৌক্তির ভাবে সমস্যার সমাধান করে। গবেষনায় দেখা গেছে যে, গঠনমূলক অভিযোজনে অভ্যস্থ ব্যক্তিরা কম নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ করে এবং এদের আত্মনিয়ন্ত্রন ক্ষমতা বেশী। সাধারণত ৩ ধরনের গঠনমূলক অভিযোজন পদ্ধতি রয়েছেঃ-

(A) ঘটনার পুনঃমূল্যায়ন অভিযোজন পদ্ধতি।

(B) সমস্যা কেন্দ্রিক অভিযোজন পদ্ধতি।

(C) আবেগ কেন্দ্রিক অভিযোজন পদ্ধতি।

(A) ঘটনার পুনঃমূল্যায়ন অভিযোজন পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতির মূল কথা হলো ঘটনাটিকে আবার নতুন করে বিবেচনা বা পুনঃমূল্যায়ন করা। যখনই আমারা কোন কাজে বিফল হই তখনই আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হই বা রেগে যাই। কিন্তু রেগে যাওয়ার বা হতাশ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করি না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুমান, বিশ্বাস, নেতিবাচক চিন্তার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজে করে। এ কারণগুলো দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির অনেকগুলো অযৌক্তিক অনুমানের মধ্যে রয়েছে, যেমন– "সবাইকে আমার সন্তুষ্ট করতে হবে", "সবকিছুতেই আমার প্রথম হতে হবে", "আমি সব সময় যেভাবে চাব সেভাবেই হবে"; ব্যক্তি যখন এই সব বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে যায় এবং তাতে সফলকাম হয় না, তখনই তার মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। যেমনঃ পপি একটি অফিসে চাকুরী করে। তার একটি অনুমান রয়েছে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে, আমি যদি সবাইকে সাহায্য না করি তাহলে অন্যেরা আমাকে স্বার্থপর বা খারাপ বলবে। তাই যখন সে অন্যকে সাহায্য করতে পারে তখন ভাল থাকে কিন্তু যখন পারে না তখন হতাশ হয়ে পড়ে। যদি খেয়াল করি আসলে একটি মানুষ কি সবাইকে সাহায্য করতে পারে? এভাবে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে ঘটনাটি পুনঃমূল্যায়ন করলে ব্যক্তি কম হতাশ হবে। আরো ২ ভাবে ঘটনার পুনঃমূল্যায়ন করা যায়।

(ক) ঠাট্টা তামাশার মাধ্যমে ঘটনাকে দেখাঃ যখন কোন ব্যক্তি চাপমূলক ঘটনাটিকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে এবং এর মাধ্যমে ঘটনাকে পুনঃমূল্যায়ন করে তখন ব্যক্তি ঐ ঘটনাটিকে একদিকে কম দুঃশ্চিন্তার মনে করে অন্যদিকে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক আবেগকে সরিয়ে ফেলতে পারে।

(খ) ইতিবাচক পুনঃমূল্যায়নঃ আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে আমরাই শুধু সমস্যায় পড়িনি আমাদের অনেকেই বড় বড় সমস্যার মধ্যে আছে অর্থাৎ অন্যের সমস্যার সাথে তুলনা করলে নিজের চাপকে পুনঃমূল্যায়ন করা সহজ হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা যেমনঃ বিবাহ-বিচ্ছেদ, অসুস্থতা, আর্থিক অবনতি ইত্যাদি থেকে ভাল অভিজ্ঞতার বা ভাল কিছুর সম্মুখীন হই। জীবনের এই ঘটনাগুলোই যদি পুনঃমূল্যায়ন করা যায় সেক্ষেত্রে চাপের সাথে ভাল মোকাবেলা করা যাবে।

(B) সমস্যা কেন্দ্রিক অভিযোজন পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে অনেক ভাবে সরাসরি সমস্যার মোকাবেলা করতে পারি। যেমনঃ

(ক) সমস্যা সমাধান

(খ) সাহায্য চাওয়া

(গ)সঠিকভাবে সময় নিয়ন্ত্রন

(ক) সম্যসা সমাধান ঃ যে কোন সমস্যা সমাধান করতে গেলে প্রথমেই সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। আমাদের সমস্যাগুলো মূলতঃ বিফলতা, দ্বন্ধ, চাপ বা যে কোন ধরনের পরিবর্তন হতে আসে। তাই সমস্যার উৎস ও বাধাগুলো জানতে পারলে সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করা সহজ হবে। তারপর ঐ সমস্যার সম্ভাব্য যতগুলো উপায় আছে সেগুলো বের করতে হবে। তবে উপায়গুলো বাস্তবসম্মত কিনা, এর সফলতার সম্ভাবনা কতটুকু সেগুলো আগে থেকেই খেয়াল রাখতে হবে। সবশেষে প্রত্যেকটি উপায়ের ভাল ও খারাপ দুটি ফলাফলই বের করতে হবে। তাহলে সবচেয়ে ভাল উপায়টি বের হবে। তবে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, "আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? কোন ফলাফলকে আমি বেশী গুরুত্ব দিব?"। আর এভাবেই সুন্দরভাবে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

(খ) সাহায্য চাওয়া ঃ অন্যের সাহায্যে আমরা সমস্যাটিকে বিভিন্ন উপায়ে দেখতে পাই। উপায়গুলো ঠিক আছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে পারি সেই সাথে অন্যের আবেগীয় সমর্থন পাই ফলে সমস্যাটিকে কম সমস্যাপূর্ণ মনে হয়।

(গ) সঠিকভাবে সময় নিয়ন্ত্রন ঃ আমরা আমাদের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব সময়ের অভাবে পালন করতে পারি না ফলে আমাদের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা তৈরি হয়। আমরা প্রতিনিয়ত অনেক সময় নষ্ট করি। আমরা যদি কিভাবে সময় নষ্ট করি সেদিকে খেয়াল করি তাহলে অনেক সময় বাচাঁতে পারব। যেমনঃ

– আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজই করি কিন্তু কোন কাজটি আগে করা দরকার বা তাতে যে বেশী সময় দেয়া দরকার সেটা বুঝতে পারি না ফলে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই প্রথমে আমাদের লক্ষ্যটাকে ঠিক করে, দৈনন্দিন কাজগুলোকে ভালভাবে খেয়াল করতে হবে। ফলে কোন্ কাজে বেশী সময় দিচ্ছি, কোন্ কাজে কম সময় দিচ্ছি তা বের হয়ে আসবে। ফলে আমরা আমাদের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দৈনন্দিন কাজগুলো ভাগ করতে পারব এবং এতে গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ করা হবে এবং সময় বাচঁবে।

– আমরা প্রায়ই অন্যকে 'না' বলতে পারি না ফলে ওদের কাজে সময় দিতে হয়, গল্প করতে হয় ও ঘুরতে হয়। ফলে নিজের কাজে যেমন ব্যঘাত হয় তেমনি সময়ও নষ্ট হয়। তাই 'না' বলার মাধ্যমে আমরা সময় বাচাঁতে পারি।

– আমরা যদি কোন্ একটি কাজ একবারে শেষ করে পরবর্তীতে আর একটি কাজে হাত দেই তাতে অনেক সময় বাঁচবে। আবার এক সাথে এক ধরনের কাজ করলে সময় বাঁচে।

– আমরা যদি ফাইলে, ডেস্কে বা ঘরে পুরনো কাগজপত্র, ম্যাগাজিন, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমিয়ে রাখি তাহলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় জিনিসটা বের করতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই জিনিসের শ্রেণী অনুযায়ী যদি একজায়গায় রাখা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা কাজের সময় পাওয়া যাবে এবং সময় বাঁচবে।

(C) আবেগ-কেন্দ্রিক অভিযোজন পদ্ধতি ঃ অনেক সময় সমস্যা-কেন্দ্রিক ও ঘটনার পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ ব্যক্তি এতটাই আবেগীয় থাকে যে সমস্যা হতে বের হয়ে আসতে পারে না। সেক্ষেত্রে আবেগ-কেন্দ্রিক অভিযোজন পদ্ধতিতে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। আমরা অনেকভাবে এই কাজটি করতে পারি।

(ক) আবেগকে প্রকাশ করে

(খ) নিজেকে দুঃশ্চিন্তা হতে সরিয়ে নিয়ে

(গ) ধ্যান করে

(ঘ) শিথিলায়নের মাধ্যমে

(ক) আবেগকে প্রকাশ করা ঃ গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা নিজেদের সমস্যা ও কষ্টকর অনুভুতি প্রকাশ করতে পারে না তারা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এজন্য প্রকাশ করাটা খুবই জরুরী। কারণ এতে কষ্টকর অনুভূতিগুলো দূর হয়ে যায়। তবে যদি বিশ্বাসযোগ্য মানুষ বা বন্ধু না থাকে, সেক্ষেত্রে নিজের কষ্টগুলো লিখে ফেললেও কষ্টকর অনুভুতিগুলো হতে রেহাই পাওয়া যায়।

আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে আমরাই শুধু সমস্যায় পড়িনি আমাদের অনেকেই বড় বড় সমস্যার মধ্যে আছে অর্থাৎ অন্যের সমস্যার সাথে তুলনা করলে নিজের চাপকে পুনঃমূল্যায়ন করা সহজ হয়।

(খ) নিজেকে দুঃশ্চিন্তা হতে সরিয়ে নেয়া ঃ অনেক সময় কষ্টকর অনুভুতিগুলো হতে রেহাই পাবার জন্য আমরা যদি অন্য চিন্তা বা অন্য কাজে নিযুক্ত হয়ে যাই সেক্ষেত্রে কষ্টকর অনুভূতি লাঘব করতে পারি।

(গ) ধ্যান করা ঃ গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত ধ্যান বা মেডিটেশন করার ফলে ব্যক্তি তার মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ক্লান্তি দূর করতে পারে, দুঃশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করে সুখী জীবন যাপন করতে পারে।

(ঘ) শিথিলায়ন ঃ গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত শিথিলায়ন বা Relaxaltion পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির ঘুমের সমস্যা, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, বিভিন্ন মানসিক চাপ ও উদ্বেগ হতে রেহাই পেয়েছে।

অনেকেই উপরোক্ত এই অভিযোজন পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি জানলেও ব্যক্তি তার হতাশা, দুঃশ্চিন্তা ও অন্যান্য কারণে তা ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারে না এবং সমস্যা হতে বের হয়ে আসতে পারে না। এভাবে চলতে চলতে ব্যক্তির পরবর্তীতে অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হতে পারেন। একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী উপরোক্ত গঠনমূলক পদ্ধতি ও আরও অনেক পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারেন।

লেখক পরিচিতি

আনার কলি একজন প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞানে অনার্স এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে এমএস ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে এমফিল করছেন।